প্যারালাল TEXT

(For HSC & Pre-Admission)

পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র

সপ্তম অধ্যায় : ভৌত আলোকবিজ্ঞান

সার্বিক ব্যবস্থাপনায়
উদ্ভাস ফিজিক্স টিম

প্রচ্ছদ
মোঃ রাকিব হোসেন

অক্ষর বিন্যাস
জায়েদ, হৃদয় ও শাওন

অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায়
মাহমুদুল হাসান সোহাগ
মুহাম্মদ আবুল হাসান লিটন

কৃতজ্ঞতা
উদ্ভাস-উন্মেষ-উত্তরণ
শিক্ষা পরিবারের সকল সদস্য

প্রকাশনায়
উদ্ভাস একাডেমিক এন্ড এডমিশন কেয়ার

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ইং

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com

কপিরাইট © উদ্ভাস

সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত। এই বইয়ের কোনো অংশই প্রতিষ্ঠানের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ফটোকপি, রেকর্ডিং, বৈদ্যুতিক বা যান্ত্রিক পদ্ধতিসহ কোনো উপায়ে পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি, বিতরণ বা প্রেরণ করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা,

তোমরা শিক্ষা জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপে পদার্পণ করেছো। মাধ্যমিকের পড়াশুনা থেকে উচ্চ মাধ্যমিকের পড়াশুনার ধাঁচ ভিন্ন এবং ব্যাপক। মাধ্যমিক পর্যন্ত যেখানে 'বোর্ড বই'-ই ছিল সব, সেখানে উচ্চ-মাধ্যমিকে বিষয়ভিত্তিক নির্দিষ্ট কোন বই নেই। কিন্তু বাজারে বোর্ড অনুমোদিত বিভিন্ন লেখকের অনেক বই পাওয়া যায়। একারণেই শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবই বাছাইয়ের ক্ষেত্রে দ্বিধায় ভোগে। এছাড়া, মাধ্যমিকের তুলনায় উচ্চ-মাধ্যমিকে সিলেবাস বিশাল হওয়া সত্ত্বেও প্রস্তুতির জন্য খুবই কম সময় পাওয়া যায়। জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই ধাপের শুরুতেই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি দিতে আমাদের এই Parallel Text। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের হতাশার একটি মুখ্য কারণ থাকে পাঠ্যবইয়ের তাত্ত্বিক আলোচনা বুঝতে না পারা। এজন্য শিক্ষার্থীদের মাঝে বুঝে বুঝে পড়ার প্রতি অনীহা তৈরি হয়। তারই ফলস্বরূপ শিক্ষার্থীরা HSC ও বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে ব্যর্থ হয়।

তোমাদের লেখাপড়াকে আরও সহজ ও প্রাণবন্ত করে তোলার বিষয়টি মাথায় রেখে আমাদের Parallel Text বইগুলো সাজানো হয়েছে সহজ-সাবলীল ভাষায়, অসংখ্য বাস্তব উদাহরণ, গল্প, কার্টুন আর চিত্র দিয়ে। প্রতিটি টপিক নিয়ে আলোচনার পরেই রয়েছে গাণিতিক উদাহরণ; যা টপিকের বাস্তব প্রয়োগ এবং গাণিতিক সমস্যা সমাধান সম্পর্কে ধারণা দেয়ার পাশাপাশি পরবর্তী টপিকগুলো বুঝতেও সাহায্য করবে। তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, পার্থক্য ইত্যাদি নির্দেশকের মাধ্যমে আলাদা করা হয়েছে। এছাড়াও যেসব বিষয়ে সাধারণত ভুল হয়, সেসব বিষয় 'সতর্কতা' এর মাধ্যমে দেখানো হয়েছে।

তবে শুধু বুঝতে পারাটাই কিন্তু যথেষ্ট নয়, তার পাশাপাশি দরকার পর্যাপ্ত অনুশীলন। আর এই বিষয়টি আরও সহজ করতে প্রতিটি অধ্যায়ের কয়েকটি টপিক শেষে যুক্ত করা হয়েছে 'টপিকভিত্তিক বিগত বছরের প্রশ্ন ও সমাধান'। যার মধ্যে রয়েছে বিগত বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নের পাশাপাশি বুয়েট, রুয়েট, কুয়েট, চুয়েট, মেডিকেল ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ও সমাধান। এভাবে ধাপে ধাপে অনুশীলন করার ফলে তোমরা বোর্ড পরীক্ষার শতভাগ প্রস্তুতির পাশাপাশি ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতিও নিতে পারবে এখন থেকেই। এছাড়াও অধ্যায় শেষে রয়েছে 'গুরুত্বপূর্ণ প্র্যাক্টিস প্রবলেম' ও 'গাণিতিক সমস্যাবলি' যা অনুশীলনের মাধ্যমে তোমাদের প্রস্তুতি পূর্ণাঙ্গ হবে।

আশা করছি, আমাদের এই Parallel Text একই সাথে উচ্চ মাধ্যমিকে তোমাদের বেসিক গঠনে সহায়তা করে HSC পরীক্ষায় A+ নিশ্চিত করবে এবং ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রাখবে।

তোমাদের সার্বিক সাফল্য ও উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনায়-

উদ্ভাস ফিজিক্স টিম

সূচিপত্র

পদার্থবিজ্ঞান ২য় পত্র

সপ্তম অধ্যায় : ভৌত আলোকবিজ্ঞান

ক্র.নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
০১	আলোর প্রাথমিক ধারণা	০১
০২	নিউটনের কণিকাতত্ত্ব	০২
০৩	ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ চুম্বকীয় তত্ত্ব	০৩
০৪	কোয়ান্টাম তত্ত্ব	০৮
০৫	হাইগেনসের তরঙ্গ তত্ত্ব	০৯
০৬	তরঙ্গমুখ	১০
০৭	হাইগেনসের নীতির সাহায্যে আলোর প্রতিসরণের ব্যাখ্যা	১৩
০৮	তরঙ্গের উপরিপাতন	১৭
০৯	তরঙ্গের তীব্রতা	১৮
১০	ব্যতিচার	১৯
১১	ইয়ং এর দ্বিচিড় পরীক্ষা	২০
১২	কেন্দ্রীয় উজ্জ্বল ডোরা	২১
১৩	**টপিক ভিত্তিক বিগত বছরের প্রশ্ন ও সমাধান**	৩০
১৪	অপবর্তন	৪০
১৫	একক চিড়ের দরুন ফ্রনহফার অপবর্তন	৪২
১৬	চরম এবং অবমের শর্ত	৪৩
১৭	গ্রেটিং এর দরুন ফ্রনহফার অপর্বতন	৪৭
১৮	আলোর সমবর্তন	৫১
১৯	ম্যালাসের সূত্র	৫৪
২০	প্রতিফলনের সাহায্যে সমবর্তন	৫৬
২১	**টপিক ভিত্তিক বিগত বছরের প্রশ্ন ও সমাধান**	৫৮
২২	একত্রে সব গুরুত্বপূর্ণ সূত্র	৬৩
২৩	গুরুত্বপূর্ণ প্র্যাক্টিস প্রবলেম	৬৪
২৪	গাণিতিক সমস্যাবলি	৬৯

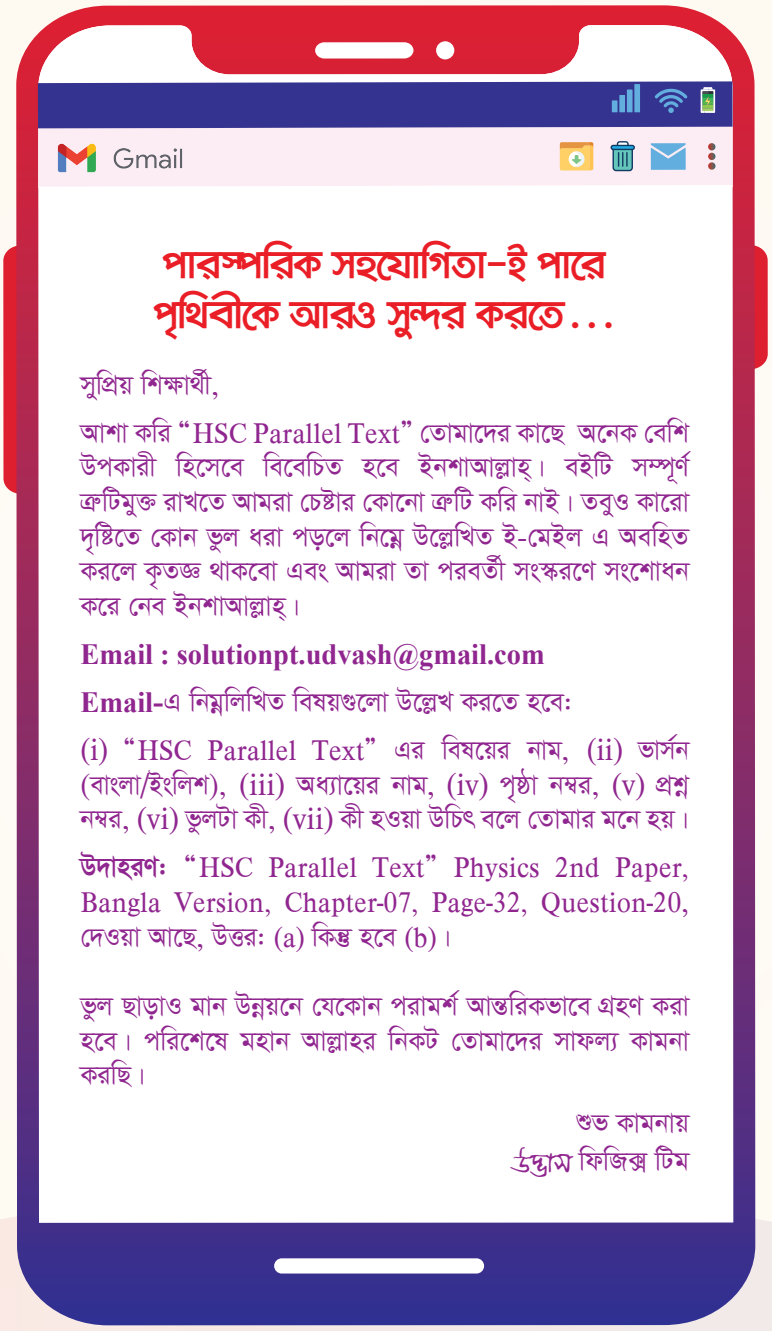

পারস্পরিক সহযোগিতা-ই পারে পৃথিবীকে আরও সুন্দর করতে...

সুপ্রিয় শিক্ষার্থী,

আশা করি "HSC Parallel Text" তোমাদের কাছে অনেক বেশি উপকারী হিসেবে বিবেচিত হবে ইনশাআল্লাহ্। বইটি সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত রাখতে আমরা চেষ্টার কোনো ত্রুটি করি নাই। তবুও কারো দৃষ্টিতে কোন ভুল ধরা পড়লে নিম্নে উল্লেখিত ই-মেইল এ অবহিত করলে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং আমরা তা পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নেব ইনশাআল্লাহ্।

Email : solutionpt.udvash@gmail.com

Email-এ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো উল্লেখ করতে হবে:

(i) "HSC Parallel Text" এর বিষয়ের নাম, (ii) ভার্সন (বাংলা/ইংলিশ), (iii) অধ্যায়ের নাম, (iv) পৃষ্ঠা নম্বর, (v) প্রশ্ন নম্বর, (vi) ভুলটা কী, (vii) কী হওয়া উচিৎ বলে তোমার মনে হয়।

উদাহরণ: "HSC Parallel Text" Physics 2nd Paper, Bangla Version, Chapter-07, Page-32, Question-20, দেওয়া আছে, উত্তর: (a) কিন্তু হবে (b)।

ভুল ছাড়াও মান উন্নয়নে যেকোন পরামর্শ আন্তরিকভাবে গ্রহণ করা হবে। পরিশেষে মহান আল্লাহর নিকট তোমাদের সাফল্য কামনা করছি।

শুভ কামনায়
উদ্ভাস ফিজিক্স টিম

অধ্যায় ০৭

ভৌত আলোকবিজ্ঞান

ধরো একটি ঘরের এক দেয়ালে দুইটি জানালা আছে। এখন একটি জানালা বন্ধ থাকলে অন্যটি দিয়ে ঘরে যে পরিমাণ আলো প্রবেশ করবে তার প্রভাব বিপরীত পাশের দেয়ালে দেখা যাবে। কিন্তু যদি দুটো জানালাই খোলা থাকে তবে আলো বেশি প্রবেশ করবে এবং বিপরীত দেয়ালে আগের চেয়ে বেশি আলো দেখা যাবে। কিন্তু যদি জানালা দুটোর প্রস্থ কমাতে কমাতে শূন্যের কাছাকাছি নিয়ে আসা হয় এবং একবর্ণী আলো প্রবেশ করানো হয় তবে বিপরীত দেয়ালে এক অসাধারণ দৃশ্য দেখা যাবে। সেখানে দেখা যাবে আলো অন্ধকারের বাহারি নকশা। তোমার মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন জাগছে, অন্ধকার কোথা থেকে এলো? এটি কীভাবে সম্ভব?

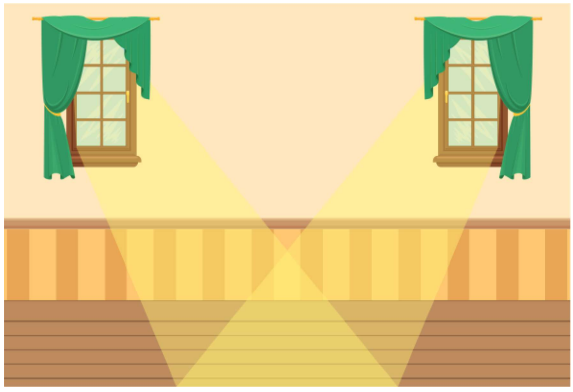

তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এমন আরো আপাত অবিশ্বাস্য আলোকীয় ঘটনা সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে তোমাদেরকে আলোর এই বিচিত্র জগতে স্বাগতম।

আলোর প্রাথমিক ধারণা

আমাদের চারপাশের সবকিছু আমরা চোখ দিয়ে দেখতে পাই। বিভিন্ন বস্তুর কোনটির আকার কেমন, রং কি, আমাদের সামনে বা চারপাশে কোথায় কোন বস্তুটি অবস্থান করছে, সবই আমরা দেখতে পাই আলোর সাহায্যে। কিন্তু আলো কীভাবে আমাদেরকে বিভিন্ন বস্তু দেখতে সহায়তা করে? আলো নিয়ে সর্বপ্রথম চিন্তাভাবনা শুরু করেন গ্রিক দার্শনিকরা প্লেটো এবং পিথাগোরাসসহ আরও বেশ কয়েকজন দার্শনিক ভাবতেন, আমরা চোখ মেললেই যেহেতু কোনোকিছু দেখতে পাই, তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের চোখ থেকে আলো বিচ্ছুরিত হয়ে বস্তুর উপর পড়ে এবং আমরা বস্তুটিকে দেখতে পাই। কিন্তু তখন প্রশ্ন থেকে যায়, তাহলে অন্ধকারের মধ্যে আমরা চোখ মেলে তাকালেও কোনোকিছু দেখতে পাই না কেন? এই প্রশ্নের উত্তর তারা দিতে পারেননি।

প্রশ্নটির উত্তর খুঁজে পেতে প্রায় এক হাজার বছর লেগে যায়! আরব বিজ্ঞানী আল-হাজেন সর্বপ্রথম এই মতবাদ দেন যে, আমাদের চোখ থেকে আলো বের হয় না, বাইরের কোনো উৎস থেকে আলো বস্তুর উপর পড়ে। আমাদের চোখ শুধু সেই আলো গ্রহণ করে এবং মস্তিষ্কে পৌঁছে দেয়। এই কারণে আলোর কোনো উৎস না থাকলে আমরা আর কোনোকিছু দেখতে পাই না এই মতবাদ থেকে আরও একটি বিষয় বোঝা যায় যে, এই জগতে খুব কম বস্তুই আছে, যাদের নিজস্ব আলো আছে। যেমন, সূর্যের নিজস্ব আলো আছে কিন্তু সৌরজগতের বাকি সদস্যদের নিজস্ব আলো নেই। সূর্য থেকে আসা আলো ফুলের উপর পড়ে, এরপর ফুলের দিকে তাকালে সেই প্রতিফলিত আলো আমাদের চোখে যায় এবং আমরা ফুলগুলোকে দেখতে পাই। কিন্তু এরপরও প্রশ্ন থেকে যায়, সূর্য থেকে আলো বলতে আসলে কি আসে, যেটির মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই? বিজ্ঞানীরা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে থাকেন।

কালের বিভিন্ন সময়ে চারজন মহান পদার্থবিদের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন আলোকীয় ঘটনার ব্যাখ্যা প্রদান করার জন্য আলোর চারটি মৌলিক তত্ত্ব উপস্থাপিত হয়। এই তত্ত্বগুলো মানুষের জানার পরিধি তথা পদার্থবিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছে। তত্ত্বগুলো হলো:

(i) নিউটনের কণিকা তত্ত্ব
(ii) হাইগেনসের তরঙ্গ তত্ত্ব
(iii) ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ চুম্বকীয় তত্ত্ব
(iv) ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব

চলো এবার তত্ত্বগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে জেনে নেওয়া যাক।

নিউটনের কণিকাতত্ত্ব

কণিকা তত্ত্বে নিউটন বলেন, আলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দিয়ে তৈরি যাদেরকে তিনি নাম দেন "করপাসল"। যে কণাগুলো অণু -পরমাণুর মতো অতি ক্ষুদ্র। নিউটন তাঁর তত্ত্ব দিয়ে আলোর বেশকিছু আচরণ ব্যাখ্যা করে ফেলেন যেমন, আলোর সরলরৈখিক গতি, প্রতিফলন এবং প্রতিসরণ। ফলে মানুষ তখন বিশ্বাস করতে শুরু করে, আলো এক প্রকার কণা। অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা নিয়ে আলো গঠিত।

কিন্তু এরপর আরও বেশকিছু প্রশ্নের উদয় হয়, তার ব্যাখ্যা নিউটনের কণিকাতত্ত্ব দিতে পারে নি নিউটন তার কণিকাতত্ত্বের মাধ্যমে আলোর প্রতিসরণ ব্যাখ্যা করেতে গিয়ে বলেছিলেন, হালকা মাধ্যম থেকে যখন আলো ঘন মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন ঘন মাধ্যমের কণাগুলো করপাসলগুলোকে হালকা মাধ্যমের তুলনায় বেশি বলে আকর্ষণ করে। তাই আলো মাধ্যম পরিবর্তন করলে দিকও পরিবর্তন করে অর্থাৎ বেঁকে যায়। এই ব্যাখ্যাতে তিনি আরও বলেছিলেন, যেহেতু ঘন মাধ্যমের কণাগুলো আলোর কণা করপাসলকে বেশি বলে আকর্ষণ করে তাই হালকা মাধ্যমের তুলনায় ঘন মাধ্যমে আলোর বেগ বেশি হবে। অর্থাৎ আলোর বেগ বাতাসের চেয়ে পানিতে বেশি হবে। কিন্তু 1850 সালে বিজ্ঞানী লিও ফুকো (Leon Foucault)

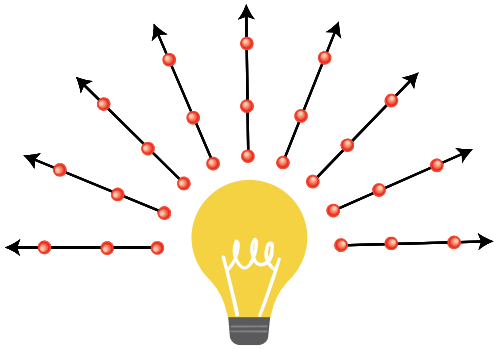

Fig 7.01

পরীক্ষালব্ধভাবে প্রমাণ করেন যে, আলোর বেগ পানির চেয়ে বাতাসে বেশি হবে। সুতরাং নিউটনের কণিকাতত্ত্ব দ্বারা আলোর প্রতিসরণ ব্যখ্যাকালে; যখন আলো হালকা থেকে ঘন কিংবা ঘন থেকে হালকা মাধ্যমে গমন করে, তখন আলোর দিক পরিবর্তন ব্যাখ্যা করা গেলেও মাধ্যমের এই পরিবর্তনে আলোর বেগের পরিবর্তন সঠিকভাবে ব্যখ্যা করা সম্ভব নয়।

আবার নিউটনের কণিকাতত্ত্ব মতে দুটি আলোর উৎস থেকে একসাথে একটির উপর আরেকটি আলো ফেললে কণাগুলো একটি আরেকটির সাথে সংঘর্ষ করার কথা এবং আলো চারপাশে ছড়িয়ে পড়ার কথা, কিন্তু এমন কোনোকিছুই আমরা দেখি না। এদিকে 1802 সালে থমাস ইয়ং তাঁর বিখ্যাত দ্বিচিড় পরীক্ষার সাহায্যে দেখান যে, দুটি প্রায় একই ধরনের আলোকে কিছু বিশেষ শর্ত সাপেক্ষে একটি পর্দায় ফেললে ব্যতিচার নামে বিশেষ এক ধরনের আলোকীয় ঘটনা ঘটে যার ফলে আলো অন্ধকার ডোরার প্যাটার্ন সৃষ্টি হয় (যেটি সম্পর্কে আমরা এই অধ্যায়েই জানতে পারবো)। আলো যদি কণার সমষ্টি হয় তাহলে এই ঘটনা ঘটার কথা না। কারণ, ব্যতিচার হয় তরঙ্গের ক্ষেত্রে। মানুষ তখন নিউটনের কণিকাতত্ত্বের বিকল্প নিয়ে আবার ভাবতে শুরু করে।

হাইগেনসের তরঙ্গ তত্ত্ব

ব্যতিচারের ব্যাখ্যা প্রদানে নিউটনের কণিকা তত্ত্বের অপারগতার পর বিজ্ঞানী হাইগেনস তাঁর তরঙ্গতত্ত্ব নিয়ে উপস্থিত হন। নিউটনের তত্ত্ব দেওয়ার মাত্র ৩ বছর পর একজন ডাচ বিজ্ঞানী ক্রিস্টিয়ান হাইগেনস একটি তত্ত্ব প্রস্তাব করেন যা "হাইগেনসের তরঙ্গ তত্ত্ব" নামে পরিচিত। যার মাধ্যমেই নিউটনের তত্ত্বের সীমাবদ্ধতাগুলো স্বচ্ছ দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তরঙ্গতত্ত্বে হাইগেনস দাবি করেন, আলো হচ্ছে এক প্রকার তরঙ্গ এবং এই তরঙ্গ তরঙ্গমুখ আকারে অনবরত গৌণ তরঙ্গ সৃষ্টির মাধ্যমে অগ্রসর হয় এই তত্ত্ব আলোর প্রতিফলন, প্রতিসরণের সাথে ব্যতিচার, অপবর্তনের মতো ঘটনাগুলোকে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয় তখন সবাই একমত হন যে, আলো আসলে এক প্রকার তরঙ্গ।

কিন্তু তরঙ্গ তত্ত্বে হাইগেনস আলোকে যান্ত্রিক তরঙ্গরূপে (অনুদৈর্ঘ্য) বর্ণনা করেছিলেন। তাই সমবর্তন নামক আলোকীয় ঘটনাটির ব্যাখ্যা হাইগেনসের তরঙ্গ তত্ত্ব দিয়ে করা যায়নি। সমবর্তন সম্বন্ধে এ অধ্যায়েই আমরা আলোচনা করবো।

Fig 7.02

মূলত আমাদের এই অধ্যায়ের আলোচ্য অধিকাংশ বিষয়বস্তু হাইগেনসের তরঙ্গ তত্ত্বকে ঘিরে। বলাই বাহুল্য পরবর্তী অংশে এই তত্ত্ব নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হবে।

ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ চুম্বকীয় তত্ত্ব

সময় যত এগোতে থাকে, তত বেশি গবেষণা হতে থাকে এবং আলোর আরও বৈশিষ্ট্য আবিষ্কৃত হতে থাকে এরই মধ্যে মাইকেল ফ্যারাডের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণিত হয়, সময়ের সাপেক্ষে চৌম্বকক্ষেত্রের পরিবর্তন ঘটালে তড়িচ্চালক শক্তি আবিষ্ট হয় অর্থাৎ চৌম্বকক্ষেত্রের প্রভাবে তড়িৎক্ষেত্র উৎপাদন করা যায়। এ ঘটনা থেকে ম্যাক্সওয়েল অনুপ্রাণিত হন এবং তাঁর তত্ত্বের মাধ্যমে দেখান যে, পরিবর্তনশীল তড়িৎ দ্বারাও চৌম্বকক্ষেত্র তৈরি করা যায়। অর্থাৎ তড়িৎক্ষেত্র এবং চৌম্বকক্ষেত্রের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। ম্যাক্সওয়েলের এই বিশেষ তত্ত্বের মাধ্যমে তড়িৎক্ষেত্র এবং চৌম্বকক্ষেত্রের এই নিবিড় সম্পর্ককে ব্যাখা করা যায়। তাই এই তত্ত্বের নাম দেওয়া হয় তড়িৎ চুম্বকীয় তত্ত্ব। তড়িৎ ক্ষেত্র $\vec{E}$ ও চৌম্বকক্ষেত্র $\vec{B}$ এর সমকোণে কম্পন ও পর্যাবৃত্ত পরিবর্তনের ফলে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ সৃষ্টি হয়।

তড়িৎ চুম্বকীয় তত্ত্বমতে যেহেতু তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ একটি অনুপ্রস্থ তরঙ্গ তাই তড়িৎক্ষেত্র E এবং চৌম্বকক্ষেত্র B এর তরঙ্গ সমীকরণ।

$E = E_0 \sin\frac{2\pi}{\lambda}(vt - x)$

$B = B_0 \sin\frac{2\pi}{\lambda}(vt - x)$

E এবং B এর অনুপ্রস্থ তরঙ্গদ্বয় পরস্পর লম্বভাবে সঞ্চালি হয়।

এখানে, E_0 = তড়িৎক্ষেত্রের তরঙ্গের বিস্তার

B_0 = চৌম্বকক্ষেত্রের তরঙ্গের বিস্তার

λ = তরঙ্গদৈর্ঘ্য

v = তরঙ্গের বেগ

x = তরঙ্গ সঞ্চালনের অক্ষ

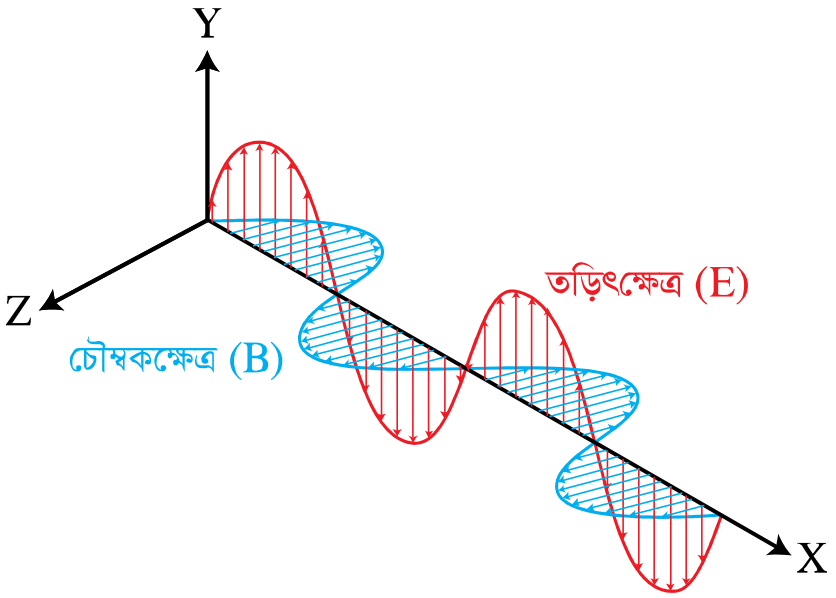

Fig 7.03

ম্যাক্সওয়েল তার তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের বেগ নির্ণয় করার জন্য অ্যাম্পিয়ারের সূত্র সংশোধন করে একটি নতুন পদ যুক্ত করেন এবং এটিকে চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞানে তরঙ্গের সাধারণ সমীকরণের সাথে তুলনা করে শূন্য মাধ্যমে এ তরঙ্গের বেগ নির্ণয় করেন,

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$$

এখানে, μ_0 = শূন্য মাধ্যমের চৌম্বক প্রবেশ্যতা

ϵ_0 = শূন্য মাধ্যমের তড়িৎ ভেদনযোগ্যতা

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} WbA^{-1}m^{-1}$ এবং $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} C^2 N^{-1}m^{-2}$ বসালে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের বেগ পাওয়া যায়।

$$v = \frac{1}{\sqrt{4\pi \times 10^{-7} \times 8.854 \times 10^{-1}}} ms^{-1}$$

$$= 3 \times 10^8 \, ms^{-1}$$

মজার ব্যাপারটি লক্ষ করো। আমরা শূন্য মাধ্যমে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের যে বেগ নির্ণয় করলাম তা শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগের সমান। (আলোর বেগ ততদিনে পরীক্ষামূলকভাবে নির্ণয় করা হয়েছিলো) তাই বলা যায় আলো একটি তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ। আলোর বেগকে আমরা "c" দিয়ে প্রকাশ করি। অর্থাৎ সূত্রটি দাঁড়ায়,

$$\boxed{c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}}$$

এবং অন্য মাধ্যমে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ অর্থাৎ আলোর বেগ,

$$c_m = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}$$

এখানে, $\mu = \mu_r\mu_0$ যেখানে, μ_r = আপেক্ষিক প্রবেশ্যতা
$\epsilon = \epsilon_r\epsilon_0$ যেখানে, ϵ_r = আপেক্ষিক ভেদনযোগ্যতা

ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ চুম্বকীয় তত্ত্ব অনুসারে তড়িৎক্ষেত্র E এবং চৌম্বকক্ষেত্র B এর সাথে c এর সম্পর্ক,

$$\boxed{c = \frac{E}{B} = \frac{E_0}{B_0}}$$

এখানে, c = আলোর বেগ।

জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল গাণিতিকভাবে তড়িৎক্ষেত্র এবং এর প্রভাবে উৎপন্ন হওয়া চৌম্বকক্ষেত্রের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে অ্যাম্পিয়ারের সূত্র সংশোধন করেন এবং একই সাথে চিরায়ত পদার্থবিদ্যায় তরঙ্গের সমীকরণের সাথে তড়িৎ ও চুম্বকক্ষেত্রের জন্য তুলনীয় সমীকরণ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমীকরণের তুলনা থেকে তিনি তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের যে বেগের মান নির্ণয় করেন তা ছিলো $3 \times 10^8\ ms^{-1}$। ততদিনে পরীক্ষামূলকভাবে আলোর যে বেগ নির্ণয় করা হয়েছিলো তার মানও ছিলো $3 \times 10^8\ ms^{-1}$। ঘটনাটি অবশ্যই কাকতালীয় নয়। বরং বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ম্যাক্সওয়েল প্রমাণ করেন যে, আলো একটি তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ এবং এই তত্ত্বের নামকরণ করা হয় তড়িৎ চুম্বকীয় তত্ত্ব।

তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য

(i) $\vec{E}$ ও $\vec{B}$ এর লম্বদিকে তরঙ্গ সঞ্চালিত হয়। তাই এটি একটি অনুপ্রস্থ তথা আড় তরঙ্গ।

(ii) শূন্য মাধ্যমে এই তরঙ্গের বেগ $3 \times 10^8 ms^{-1}$।

(iii) এই তরঙ্গের বেগ c, কম্পাঙ্ক f ও তরঙ্গদৈর্ঘ্য λ হলে, $c = f\lambda$।

(iv) এই তরঙ্গ প্রবাহের জন্য মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না।

(v) তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের ভর নেই, কিন্তু শক্তি আছে।

(vi) এই তরঙ্গের তীব্রতা, উৎস হতে দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক অর্থাৎ, তীব্রতা E এবং উৎস হতে দূরত্ব r হলে, $E \propto \frac{1}{r^2}$।

জেনে রাখো

$c = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}$ সমীকরণ থেকে দেখা যায়, আলোর বেগ শুধুমাত্র μ এবং ϵ এর উপর নির্ভরশীল। μ হলো কোনো মাধ্যমের চৌম্বক প্রবেশ্যতা এবং ϵ হলো মাধ্যমের তড়িৎ ভেদনযোগ্যতা। চৌম্বক প্রবেশ্যতা এবং তড়িৎ ভেদনযোগ্যতা এ মহাবিশ্বের যেকোনো মাধ্যমের সহজাত বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ, আলোর বেগ এবং বৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র মাধ্যমের প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। μ এবং ϵ উভয়েই আলোর বেগ c এর সাথে ব্যস্তানুপাতিকভাবে সম্পর্কিত। অর্থাৎ μ এবং ϵ এর মান যত কম হবে c এর মান তত বেশি হবে। কিন্তু কত বেশি? শূন্য মাধ্যম এমন একটি মাধ্যম যার সংজ্ঞা থেকে জানা যায় এ মাধ্যমের μ এবং ϵ এর মান সর্বনিম্ন। $\mu\epsilon$ রাশিটিকে কোনো মাধ্যমের ভেতর দিয়ে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের প্রবেশের ক্ষেত্রে মাধ্যম কর্তৃক সম্মিলিত বাধার সাথে তুলনা করা যায়। যেহেতু শূন্য মাধ্যমের বাধা সবচেয়ে কম ।তাই শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ সর্বোচ্চ, যার মান,

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\epsilon_0}} = 3 \times 10^8\ ms^{-1}$$

আলোর এই বেগকে মহাবিশ্বের সর্বোচ্চ গতিসীমা বলা হয়। আইনস্টাইন দেখান যে, কোনো কিছুই আলোর চেয়ে বেশি বেগে চলতে পারে না। একমাত্র ভরহীন কণাই আলোর বেগে চলতে পারে। ভরহীন এই কণাকে নামকরণ করা হয় "ফোটন"। অর্থাৎ আলোকে ভরহীন কণার প্রবাহ বলা যেতে পারে। অর্থাৎ, আশ্চর্যভাবে আমরা আবারও আলোকে 'কণা' বলছি। কিন্তু ফোটন কণাটি খুবই অদ্ভুত। এর স্থির ভর শূন্য কিন্তু ভরবেগ এবং শক্তি থাকে এবং কণাটি আলোর বেগে চলে। এ সম্বন্ধে পরবর্তীতে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান অধ্যায়ে আবারও আলোচনা করা হবে।

উদাহরণ-০১: তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গে গতিপথের নির্দিষ্ট বিন্দুতে তড়িৎ ক্ষেত্র, $\vec{E} = 17\hat{j}\ Vm^{-1}$। ঐ বিন্দুতে চৌম্বকক্ষেত্র B এর মান কত?

সমাধান: $|\vec{E}| = \sqrt{17^2} = 17 Vm^{-1}$

আমরা জানি, আলোর বেগ, $c = 3 \times 10^8 ms^{-1}$

$$\text{এবং } c = \frac{E}{B}$$

$$\Rightarrow B = \frac{E}{c}$$

$$= \frac{17}{3\times10^8}$$

$$= 5.67 \times 10^{-8} T \quad \textbf{(Ans.)}$$

উদাহরণ- ০২: কোনো মাধ্যমের আপেক্ষিক চৌম্বক প্রবেশ্যতা 0.019 এবং আপেক্ষিক তড়িৎ ভেদনযোগ্যতা 72। ঐ মাধ্যমে আলোর বেগ কত?

সমাধান: দেওয়া আছে, আপেক্ষিক চৌম্বক প্রবেশ্যতা, $\mu_r = 0.019$

আপেক্ষিক তড়িৎ ভেদনযোগ্যতা, $\epsilon_r = 72$

আমরা জানি, শূন্য মাধ্যমে তড়িৎ ভেদনযোগ্যতা, $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} C^2 N^{-1} m^{-2}$

শূন্য মাধ্যমে চৌম্বক ভেদনযোগ্যতা, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ NA^{-2}$

এখন, ঐ মাধ্যমে আলোর বেগ, $c_m = \frac{1}{\sqrt{\mu_r \mu_o \epsilon_r \epsilon_0}}$

$$= \frac{1}{\sqrt{72\times8.854\times10^{-12}\times0.019\times4\pi\times10^{-7}}}$$

$$\therefore c_m = 2.56 \times 10^8 ms^{-1} \quad \textbf{(Ans.)}$$

উদাহরণ-০৩: শূন্য মাধ্যমে কোনো একটি তাড়িৎচুম্বক তরঙ্গের তড়িৎক্ষেত্রের সমীকরণ, $E = 50 \sin(100t - 1$ । তাহলে, তরঙ্গের সাথে সংশ্লিষ্ট চুমবকক্ষেত্রের সমীকরণ কেমন হবে?

সমাধান: এখানে, তড়িৎক্ষেত্রের সমীকরণ দেওয়া আছে , $E = 50 \sin(100t - 10x)$

বা, $E = 50 \sin 10(10t - x)$

সমীকরণটিকে $E = E_0 \sin\frac{2\pi}{\lambda}(vt - x)$ সমীকরণের সাথে তুলনা করে পাই,

$$E_0 = 50$$

$$\frac{2\pi}{\lambda} = 10 \text{ বা, } \lambda = \frac{\pi}{5}$$

এবং, $v = 10$

তাহলে, চুম্বক্ষেত্রের ক্ষেত্রেও তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও কণার বেগ একই থাকবে। চুম্বকক্ষেত্রের বিস্তার, B_0 হলে,

$$c = \frac{E_0}{B_0}$$

$$\text{বা, } B_0 = \frac{50}{3\times10^8}$$

$$= 1.67 \times 10^{-7}\ T$$

তাহলে, চুম্বক্ষেত্রের সমীকরণ, $B = B_0 \sin\frac{2\pi}{\lambda}(vt - x)$

$$= 1.67 \times 10^{-7} \sin\frac{2\pi}{\frac{\pi}{5}}(10t - x)$$

$$= 1.67 \times 10^{-7} \sin 10(10t - x)$$

$$= 1.67 \times 10^{-7} \sin(100t - 10x)$$

এটিই হচ্ছে আমাদের চুম্বকক্ষেত্রের সমীকরণ, $B = 1.67 \times 10^{-7} \sin(100t - 10x)$ **(Ans.)**

তড়িৎ চুম্বকীয় বর্ণালি

তড়িৎক্ষেত্র ও চৌম্বকক্ষেত্রের পর্যাবৃত্ত পরিবর্তন তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণের সৃষ্টি করে। এসব বিকিরণগুলো হলো বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট তরঙ্গ। এসব তরঙ্গগুলোকে একত্রে তড়িৎ চুম্বকীয় বর্ণালি বলে। তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের ক্ষেত্রে বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে এই বর্ণালিকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

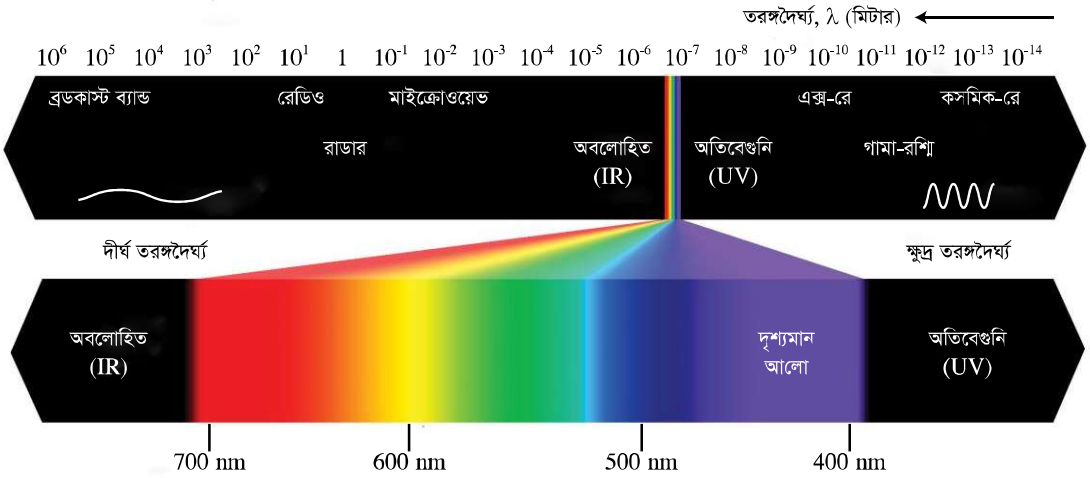

Fig 7.04

(i) বেতার তরঙ্গ: এর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিসর 10^{-4} m থেকে 5×10^{4} m পর্যন্ত। উচ্চ কম্পাঙ্কের স্পন্দিত তড়িৎ প্রবাহ ও পরমাণুস্থ ইলেক্ট্রনের খুবই ক্ষুদ্র পরিমাণ শক্তির পরিবর্তনের ফলে এই তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। তড়িৎ স্পন্দন প্রস্তুতকারী ট্রান্সমিটার, অ্যান্টেনা প্রভৃতি বেতার তরঙ্গের উৎস। দূরবর্তী স্থানে শব্দ এবং স্পন্দিত ছবি প্রেরণে এর ব্যবহার রয়ে

(ii) মাইক্রোওয়েভ: এর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিসর 10^{-3}m থেকে 10^{-1} m পর্যন্ত। স্থায়ী তড়িৎ দ্বিমেরু ভ্রামক সম্পন্ন দ্বিপরমাণুর ঘূর্ণন এই তরঙ্গের সৃষ্টি করে। ক্লাইসট্রন ও ম্যাগনেট্রন নামক বাল্ব, MASER অর্থাৎ বিকিরণের উদ্দীপিত নিঃসরণ প্রভৃতি এই তরঙ্গের উৎস। রাডার যন্ত্রে, নৌ ও বিমান চালনায়, রেডিও যোগাযোগ ব্যবস্থায়, শিল্প কারখানায়, খাবার গরম ও রান্নার কাজে এই তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়

(iii) অবলোহিত রশ্মি: এর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিসর 4×10^{-7} m থেকে 10^{-3}m পর্যন্ত ইলেক্ট্রনের ক্ষুদ্র শক্তির পরিবর্তন, স্থায়ী তড়িৎ দ্বিমেরু ভ্রামক সম্পন্ন ত্রিপরমাণুর কম্পনের ফলে এই রশ্মি দেখা যায়। উত্তপ্ত সব ধরনের বস্তু, IR Lamp থেকে এই রশ্মি বিকিরিত হয় অন্ধকারে দেখার জন্য, চিকিৎসায়, জ্যোতির্বিদ্যায় ইত্যাদি বহু ক্ষেত্রে এই রশ্মি ব্যবহৃত হয়।

(iv) দৃশ্যমান আলা: এর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিসর 3.8×10^{-7} m থেকে 7.8×10^{-7} m পর্যন্ত। একে প্রধানত সাত রঙে ভাগ করা যায়

নাম	তরঙ্গদৈর্ঘ্য
বেগুনি	3.8×10^{-7}m থেকে 4.25×10^{-7}m
নীল	4.25×10^{-7}m থেকে 4.45×10^{-7}m
আসমানি	4.45×10^{-7}m থেকে 5×10^{-7}m
সবুজ	5×10^{-7}m থেকে 5.75×10^{-7}m
হলুদ	5.75×10^{-7}m থেকে 5.85×10^{-7}m
কমলা	5.85×10^{-7}m থেকে 6.2×10^{-7}m
লাল	6.2×10^{-7}m থেকে 7.8×10^{-7}m

সহজে মনে রাখার জন্য এদের নামের আদ্যক্ষরগুলো নিয়ে বাংলায় 'বেনীআসহকলা' ও ইংরেজিতে 'VIBGYOR' শব্দ গঠিত হয়েছে। এসব আলোর জন্যই আমরা চোখে দেখি, উদ্ভিদে সালোকসংশ্লেষণ ঘটে। পরমাণুস্থ ইলেক্ট্রনের শক্তি পরিবর্তনের সময় এই রশ্মি বিকিরিত হয় অগ্নিশিখা, সূর্যরশ্মি বা যেকোনো ধরনের বাতি থেকেই এই রশ্মি বিকিরিত হয়

(v) অতিবেগুনি রশ্মি: এর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিসর 5×10^{-9} m থেকে 5×10^{-7} m পর্যন্ত ইলেক্ট্রনের শক্তি পরিবর্তনের সময় এই রশ্মি নির্গত হয়। খুবই উত্তপ্ত বস্তু (যেমন: তড়িৎ বিচ্ছুরণ), কোয়ার্টজ টিউবে তড়িৎ ক্ষরণ এবং সূর্য রশ্মি হতে এই রশ্মি পাওয়া যায়। আয়নায়ন, প্রতিপ্রভা সৃষ্টি, ফটো-ইলেক্ট্রিক ক্রিয়ায় শরীরে ভিটামিন ডি তৈরিসহ বিভিন্ন কাজে এই রশ্মি ব্যবহৃত হয়।

(vi) এক্স রশ্মি: এর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিসর 5×10^{-15} m থেকে 5×10^{-8} m পর্যন্ত। এক্সরে টিউবে উচ্চ গতির ইলেক্ট্রন মন্দন সৃষ্টির মাধ্যমে, ভারী মৌলের পরমাণুকে উচ্চশক্তির ইলেক্ট্রন দ্বারা আঘাতের ফলে এই রশ্মি সৃষ্টি হয় এক্সরে টিউব থেকে এক্স-রে নির্গত হয় চিকিৎসা, গবেষণা, শিল্প-কারখানা, নিরাপত্তা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই রশ্মি ব্যবহৃত হয়।

(vii) গামা রশ্মি: এর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিসর 5×10^{-15} m থেকে 5×10^{-11} m পর্যন্ত পরমাণুর নিউক্লিয়াস উত্তেজিত হয়ে উচ্চ শক্তিস্তর হতে নিম্ন শক্তিস্তরে স্থানান্তরের সময়, তেজস্ক্রিয় পরমাণুর ভাঙনে বা সূর্যের ফিউশনের জন্য এসব রশ্মি সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন রোগ নির্ণয়ে, গবেষণায়, ক্যান্সার কোষকে ধ্বংস করতে, ধাতব পদার্থের খুঁত নির্ণয়ে এই রশ্মি ব্যবহৃত হয়।

জেনে রাখো

উপর্যুক্ত রশ্মিসমূহকে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ঊর্ধ্বক্রমে সাজালে দেখা যা যে, গামা-রে < এক্স-রে < অতিবেগুনি রশ্মি < দৃশ্যমান আলো < অবলোহিত রশ্মি < মাইক্রোওয়েভ < বেতার তরঙ্গ।

পয়েন্টিং ভেক্টর

জন হেনরি পয়েন্টিং (John Henry Poynting) 1884 সালে তত্ত্বীয়ভাবে দেখান যে, তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ শক্তি পরিবহন করে। যার সমীকরণ হিসেবে তিনি দেখান,

$$\boxed{\bar{S} = \frac{1}{\mu_0}(\bar{E} \times \bar{B})}$$

এখানে,

$\bar{E}$ = তড়িৎক্ষেত্র ভেক্টর

$\bar{B}$ = চৌম্বকক্ষেত্র ভেক্টর

μ_0 = শূন্য মাধ্যমের চৌম্বক প্রবেশ্যতা।

$\bar{S}$ হলো পয়েন্টিং ভেক্টর যার দিক $\bar{E} \times \bar{B}$ এর দিকে অর্থাৎ $\bar{E}$ এবং $\bar{B}$ যথাক্রমে যে দুটি তলে অবস্থিত তাদের উভয়ের সাথে লম্বদিক বরাবর (ক্রস গুণনের "ডানহাতি স্ক্রু" নিয়মানুযায়ী)। পয়েন্টিং ভেক্টরের দিকেই তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ প্রবাহিত হয়।

চলো এবার পয়েন্টিং ভেক্টর এর মান কত হবে দেখা যাক।

$$\bar{S} = \frac{1}{\mu_0}(\bar{E} \times \bar{B})$$

$\bar{E}$ এবং $\bar{B}$ সর্বদা 90° কোণে থাকে তাই বলা যায়,

$$\bar{S} = \frac{1}{\mu_0}\hat{n}EB\sin\theta \quad [\hat{n} \text{ একক ভেক্টর}]$$

$$\therefore |\bar{S}| = \frac{1}{\mu_0} EB\sin 90° \quad [\because |\hat{n}| = 1]$$

$$\Rightarrow \boxed{S = \frac{1}{\mu_0} EB}$$

আমরা জেনেছি, E এবং B এর মধ্যে সম্পর্ক,

$$\frac{E}{B} = c$$

$$\therefore E = Bc \text{ অথবা, } B = \frac{E}{c}$$

এখন E এর মান বসালে পয়েন্টিং ভেক্টরের মান পাওয়া যায়,

$$S = \frac{1}{\mu_0} Bc.B$$

$$\Rightarrow S = \frac{c}{\mu_0} B^2$$

$$\therefore \boxed{S \propto B^2}$$

আবার B এর মান বসালে পয়েন্টিং ভেক্টরের মান পাওয়া যায়,

$$S = \frac{1}{\mu_0} E.\frac{E}{c}$$

$$\Rightarrow S = \frac{1}{\mu_0 c} E^2$$

$$\therefore \boxed{S \propto E^2}$$

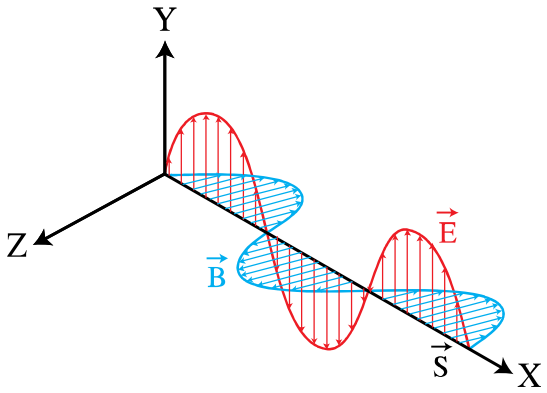

Fig 7.05

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পয়েন্টিং ভেক্টরের মান তড়িৎক্ষেত্র (E) কিংবা চৌম্বকক্ষেত্র (B) এর মানের বর্গের সাথে সমানুপাতিকভাবে সম্পর্কি তরঙ্গ অধ্যায় থেকে আমরা জেনেছিলাম, তীব্রতা তরঙ্গের বিস্তারের সমানুপাতিক। অর্থাৎ, $I \propto A^2$

সুতরাং সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে, পয়েন্টিং ভেক্টর $(\vec{S})$ এর মান তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের তীব্রতা নির্দেশ করে। অর্থাৎ $\vec{S}$ এর একক হবে তীব্রতার একক Wm^{-2} (ওয়াট/মিটার^২)। এককটিকে বিশ্লেষণ করা যাক,

$$Wm^{-2} = \frac{1W}{1m^2}$$

$$= \frac{1Js^{-1}}{1m^2} \quad [\because 1W = 1Js^{-1}]$$

$$= Jm^{-2}s^{-1}$$

∴ পয়েন্টিং ভেক্টর নির্দেশ করে, $\bar{E}$ এবং $\bar{B}$ উভয়ের লম্বদিক (তরঙ্গ সঞ্চালনের দিক) বরাবর প্রতি একক ক্ষেত্রফলের ভেতর দিয়ে, প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ তড়িৎ চুম্বকীয় শক্তি সঞ্চালিত হয় তার পরিমাণ।

চিন্তা করো

$S = \frac{c}{\mu_0} B^2$ বা, $S = \frac{1}{\mu_0 c} E^2$ উভয় সমীকরণে দেখা যাচ্ছে, পয়েন্টিং ভেক্টরের মান চৌম্বক প্রবেশ্যতা μ এর উপর নির্ভর করে। তবে কি পয়েন্টিং ভেক্টরের মানের উপর মাধ্যমের তড়িৎ ভেদনযোগ্যতার কোনো প্রভাব নেই?

উদাহরণ-০৪: একটি তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের গতিপথের নির্দিষ্ট কোনো বিন্দুতে তড়িৎক্ষেত্রে, $\vec{E} = 3\hat{i} + 4\hat{j}\ Vm^{-1}$। পয়েন্টিং ভেক্টরের মান কত?

সমাধান: $|\vec{E}| = \sqrt{9+16} = 5\ Vm^{-2}$

∴ পয়েটিং ভেক্টর, $S = \frac{1}{\mu_0 c} \times |\vec{E}|^2 = 0.066 Wm^{-2}$

μ_0 = শূন্য মাধ্যমে চৌম্বক প্রবেশ্যতা $= 4\pi \times 10^{-7} WbA^{-1}m^{-1}$
c = আলোর বেগ $= 3 \times 10^8 ms^{-1}$

কোয়ান্টাম তত্ত্ব

জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ চুম্বকীয় তত্ত্ব দ্বারা প্রতিফলন, প্রতিসরণ, ব্যতিচার, অপবর্তন, এবং সমবর্তনের মতো আলোকীয় ঘটনাগুলো ব্যাখ্যা করা যায়। এদিকে 1887 সালে হেনরিখ হার্জ তার বিখ্যাত ফটোতড়িৎ ক্রিয়া আবিষ্ক করেন (এ বিষয়ে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে জানবো)। তড়িৎ চুম্বকীয় তত্ত্ব দ্বারা এ ঘটনাটির ব্যাখ্যা করা যায় না। ফটোতড়িৎ ক্রিয়াকে (Photoelectric Effect) সংক্ষেপে বললে, ধাতব পৃষ্ঠে পর্যাপ্ত শক্তি সম্পন্ন ফোটন বা আলো আপতিত হলে ধাতব পৃষ্ঠ থেকে ইলেকট্রন নির্গত হয় এই ইলেকট্রনকে বর্তনীর মাধ্যমে প্রবাহিত করে তড়িৎপ্রবাহ পাওয়া যায়। এ প্রক্রিয়াটিকে ফটোতড়িৎ ক্রিয়া বলা হয়। যেহেতু ফটোতড়িৎ ক্রিয়াতে আলো এবং পদার্থের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া ঘটে তাই চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞান দ্বারা এটিকে ব্যাখ্যা করা যায় না এদিকে 1900 সালে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিকিরিত শক্তি এবং কম্পাঙ্কের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করে

তাৎপর্যপূর্ণ এই সমীকরণটি হলো,

$$E = hf$$

যেখানে, E = বিকিরিত শক্তির পরিমাণ
f = বিকিরণের কম্পাঙ্ক
h = প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক

প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক h আবিষ্কার করা ছিলো যুগান্তকারী ঘটনা। ম্যাক্স-প্ল্যাঙ্ক দেখিয়েছিলেন শক্তি "প্যাকেট" আকারে প্রবাহিত হয়। যার নাম দেওয়া হয় "কোয়ান্টা" এবং তত্ত্বটির নাম দেওয়া হয় "কোয়ান্টাম তত্ত্ব"। এরই মাধ্যমে পদার্থবিজ্ঞানের এক নতুন দ্বার উন্মোচিত হয় যার নাম "কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞান"।

হেনরিখ হার্জের পরীক্ষালব্ধ ধারণা এবং ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রয়োগে তত্ত্বীয়ভাবে 1905 সালে আলবার্ট আইনস্টাইন এক যুগান্তকারী ধারণার জন্ম দেন। তিনি দেখান, আলো অর্থাৎ ফোটন একইসাথে কণা আবার একই সাথে তরঙ্গ।

অর্থাৎ আলোকে শুধু কণা কিংবা শুধু তরঙ্গ বলা যায় না বরং আলো একইসাথে কণা এবং তরঙ্গ উভয়ই। তবে আলো পর্যবেক্ষণকারী পর্যবেক্ষকের প্রক্রিয়া বা পদ্ধতির উপর নির্ভর করে আলো তার যেকোনো একটি চরিত্র-কণা কিংবা তরঙ্গধর্ম প্রদর্শন করে

তাহলে, আমরা যদি আবার শুরুর প্রশ্নটাতে ফেরত যাই, আলো আসলে কি? উত্তর হলো আলো কণা এবং তরঙ্গ দুটোই কখনো এটি তরঙ্গের মত আচরণ করে, কখনো কণার মত। আসলে, এতদিন পর্যন্ত আমরা পদার্থবিজ্ঞানে যেসব পদার্থ ও শক্তি নিয়ে জেনে এসেছি সেসব থেকে আলো বেশ আলাদা। এই কারণে আমাদের এভাবে উত্তর দিতে হচ্ছে। এসব কথা শুনে আগেই ভয় পেয়ে যেওনা, আমরা আস্তে আস্তে সব আলোচনা করবো। আলোর তরঙ্গ বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গেলে, আলো এক প্রকার তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ যা চৌম্বকক্ষেত্র ও তড়িৎ ক্ষেত্রের সমন্বয়ে তৈরি হয়। তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বেশকিছু পাল্লা বা রেঞ্জ আছে। তরঙ্গদৈর্ঘ্য একেকরকম হলে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ একেকরকম আচরণ করে এবং তার উপর ভিত্তি করে সেটি একেক কাজে ব্যবহার করা হয়। তরঙ্গদৈর্ঘ্য খুব কম হলে, সেটিকে গামা রশ্মি, এক্স-রে এসব বলা হয়। তরঙ্গদৈর্ঘ্য 380-780 nm হলে, সেটি লাল, কমলা, হলুদ ইত্যাদি রংধনুর সাতরঙে দৃশ্যমান আলো হিসেবে আমাদের চোখে ধরা দেয়।

এই হচ্ছে আলো বিষয়ে আমাদের প্রাথমিক যেসব বিষয় জানা থাকা প্রয়োজন, তার একটি সারসংক্ষেপ। এই অধ্যায়ে আমরা আমাদের পাঠ্যক্রম অনুসারে তিনটি আলোকীয় ঘটনা-ব্যতিচার, অপবর্তন এবং সমবর্তন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। এ উদ্দেশ্যে হাইগেনসের তরঙ্গ তত্ত্ব সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা প্রয়োজন। চলো এখন তরঙ্গতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশদ জেনে নেওয়া যাক।

হাইগেনসের তরঙ্গ তত্ত্ব

ধরা যাক, একটি কক্ষে একটি লাইট বাল্ব জ্বালানো আছে এবং সেখান থেকে আলোকশক্তি নির্গত হচ্ছে এবং চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে। নিউটন ভেবেছিলেন আলোক কণা করপাসল খুব দ্রুত গতিতে বাল্ব থেকে নির্গত হচ্ছে। অর্থাৎ, করপাসলগুলো বাল্ব থেকে উৎপন্ন হয়ে বুলেটের মতো করে একের পর এক নির্গত হয়ে এই আলোকশক্তি বহন করছে। কিন্তু হাইগেনস অন্যভাবে ভাবলেন। তিনি প্রস্তাব করলেন, আলোর কণা উৎপন্ন হচ্ছে না বরং আলো হলো আলোক শক্তির উৎসের প্রভাবে মাধ্যমের কণাগুলোর সম্মি কম্পনে উৎপন্ন হওয়া আলোড়ন। ঠিক যেমন স্থির পানিতে একটি মার্বেল ফেলে দিলে পানির কণার আলোড়ন শুরু হয় এবং সেই আলোড়ন সঞ্চালিত হয় পানি মাধ্যমকে অবলম্বন করে **(Fig 7.06)**। এক্ষেত্রে মাধ্যমের কণাগুলো আলোড়িত হচ্ছে কিন্তু তারা নিজেরা প্রবাহিত হচ্ছে না বরং নিজের জায়গায় অবস্থান করে শুধুমাত্র স্পন্দিত হচ্ছে অর্থাৎ এই যুক্তিমতে, আলোকশক্তির উৎস অবশ্যই কোনো মাধ্যমের কণাকে আলোড়িত করছে কিন্তু মাধ্যমের কণাগুলো নিজেরা প্রবাহিত হচ্ছে না। এই মাধ্যমটি কিন্তু বায়ু মাধ্যম নয়, কারণ সূর্য থেকে যে আলো পৃথিবীতে আসে, তা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার আগে শূন্য মাধ্যমের ভেতর দিয়ে আসে। এক্ষেত্রে তাহলে সূর্য থেকে উৎপন্ন আলোকশক্তি কোন মাধ্যমের কণাকে আলোড়িত করছে? এর উত্তর সে সময়ে সবার জানা ছিলো। সেই মাধ্যমটির নাম হলো "ইথার মাধ্যম" যা সারা মহাবিশ্বে বিস্তৃত সার্বজনীন এক কল্পিত সমস মাধ্য অর্থাৎ, আলো হলো ইথার মাধ্যমের ভেতর দিয়ে সঞ্চালিত হওয়া আলোড়ন। অর্থাৎ, আলোক সঞ্চালনের এই ঘটনাটি পানিতে সৃষ্ট এই আলোড়নের সাথে তুলনীয়। পানিতে সৃষ্ট এই আলোড়নের নাম দেওয়া হয়েছে "তরঙ্গ"। অর্থাৎ, হাইগেনসের প্রস্তাবনা অনুযায়ী বলা যায়, আলো হলো এক প্রকার তরঙ্গ যা ইথার মাধ্যমের ভেতর দিয়ে সঞ্চালিত হয়। এজন্য এ প্রস্তাবনাকে "হাইগেনসের তরঙ্গ তত্ত্ব" বলে অভিহিত করা হয়

এখন প্রশ্ন হলো এই তরঙ্গ কীভাবে সঞ্চালিত হয়? এর উত্তর হলো- ঠিক যেমন করে পানির তরঙ্গ সঞ্চালিত হয় **Fig 7.06**। ছবিতে দেখা যাচ্ছে মার্বেলটি পানির যে স্থানে পতিত হয়েছে সেখান থেকে ছোট গোলাকার আকৃতির "কিছু একটা" একের পর এক নির্গত হচ্ছে এবং সময়ের সাথে সুষমভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, কোনো এক সময়ে লাল রঙের বৃত্তটির উপরস্থ সকল কণা কিছুটা উঁচুতে আছে এবং হলুদ রঙের বৃত্তটির উপরস্থ সকল কণা কিছুটা নিচে আছে। অর্থাৎ, একই রঙের বৃত্তের উপরস্থ সকল কণা একই অবস্থায় আছে। পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় আমরা বলি কণাগুলো একই দশায় আছে। সমদশা সম্পন্ন কণাগুলোর এই বৃত্তাকার "কিছু একটা" কে হাইগেনস নামকরণ করেছেন "তরঙ্গমুখ (wavefront)"। অর্থাৎ, তরঙ্গমুখের এই সমাহারকেই আমরা তরঙ্গ বলতে পারি। সুতরাং আলোর ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে বলা যায়, আলোক উৎস থেকে নির্গত আলোকশক্তি মাধ্যমের ভেতর দিয়ে একের পর এক তরঙ্গমুখ উৎপন্ন করে তরঙ্গরূপে সঞ্চালিত হয়।

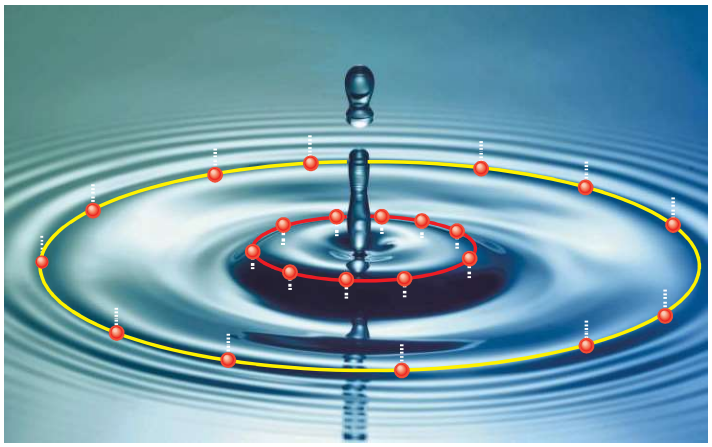

Fig 7.06

এখন একটি তরঙ্গমুখ থেকে পরবর্তী তরঙ্গমুখ কীভাবে উৎপন্ন হচ্ছে এবং এ তরঙ্গমুখের প্রকৃতি, আচরণ এবং সঞ্চালনের পদ্ধতি বুঝতে পারলে খুব সহজেই আমরা হাইগেনসের তরঙ্গ তত্ত্ব সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবো। তাই চলো প্রথমে তরঙ্গমুখ সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নেওয়া যাক।

তরঙ্গমুখ

আমরা জানি, কোনো একটি মাধ্যমের বিভিন্ন কণার সম্মিলিত কম্পনের ফলে মাধ্যমে একটি আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এই আলোড়নকে তরঙ্গ বলে যেমন: পুকুরের স্থির পানিতে ঢিল ছুঁড়লে তরঙ্গ উৎপন্ন হয় যা উৎপত্তিস্থল থেকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

গিটারের তারের মধ্যেও যেখানে হাত বা পিক দিয়ে তরঙ্গ উৎপন্ন করা হয় সেখ থেকে তা সবদিকে বিস্তৃত হয়। তরঙ্গ সম্পর্কে আমরা ১ম পত্রের নবম অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে জানতে পেরেছি। সেখানে আমরা তরঙ্গের গতির সমীকরণ দেখেছি।

মনে করি, আলোর একটি বিন্দু উৎস S থেকে আলোর তরঙ্গ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে $t = 0$ সময়ে উৎস S থেকে কোনো আলো বের হয়নি $t = t_1$ সময়ে তরঙ্গের উপরস্থ প্রত্যেকটি কণা যথাক্রমে A, B, C, D, E, F, G এবং H সবদিকে একই দূরত্ব x অতিক্রম করেছে। তাহলে প্রতিটি কণা এবং তাদের দশা হলো,

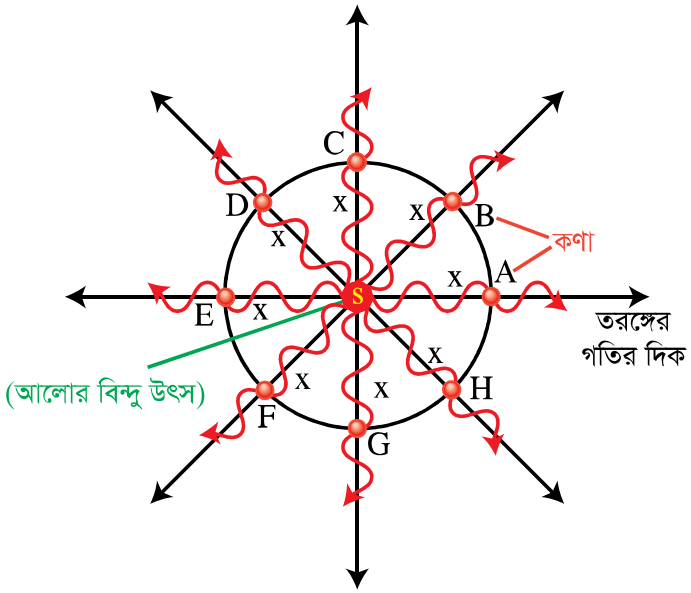

Fig 7.07

কণা	দশা
A	$\omega t_1 + kx$
B	$\omega t_1 + kx$
C	$\omega t_1 + kx$
⋮	⋮
⋮	⋮
⋮	⋮
H	$\omega t_1 + kx$

অর্থাৎ, এখানে, t_1 সময় পরে তরঙ্গের কণাগুলোর প্রত্যেকটির দশা একই, তাই আমরা কণাগুলোকে সমদশাসম্পন্ন বলতে পারি। এখন এই সমদশাসম্পন্ন কণাগুলোকে ত্রিমাত্রিকভাবে একটি তল দ্বারা সংযুক্ত করলে আমরা যে গোলকীয় (spherical) তল পাবো, সেটিই তরঙ্গমুখ। অর্থাৎ, আমরা তরঙ্গমুখকে সমদশাসম্পন্ন কণাসমূহের সঞ্চারপথ হিসেবেও অভিহিত করতে পারি।

তরঙ্গমুখ: তরঙ্গের উপরিস্থিত সমদশাসম্পন্ন কণাগুলো যে তলে অবস্থান করে তাকে সৃষ্ট তরঙ্গের তরঙ্গমুখ বলে।

অথবা আমরা যদি অন্যভাবে বলতে চাই তবে, যে কোনো সময়ে একই দশায় থাকা বিন্দুগুলো যে রেখা বা তলের উপর অবস্থিত থাকে তাকে তরঙ্গমুখ বলে। তরঙ্গমুখের যেকোনো বিন্দুতে তরঙ্গ সঞ্চালনের দিক, ঐ বিন্দুতে অঙ্কিত তরঙ্গমুখের তলের স্পর্শকের সাথে লম্ব বরাব এখন এই তরঙ্গমুখ উৎসের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। চলো আমরা এখন বিভিন্ন ধরনের তরঙ্গমুখ সম্পর্কে জেনে আসি।

(i) গোলকীয় তরঙ্গমুখ (Spherical Wavefront): যদি কোথাও আলোর একটি বিন্দু উৎস S থাকে, তবে সেখান থেকে যে তরঙ্গমুখগুলো উৎপন্ন হবে তা হবে গোলকীয় বা গোলকের মতো এবং তরঙ্গমুখের সাথে তরঙ্গের গতির দিক হবে লম্ব বরাবর **(Fig 7.08)**।

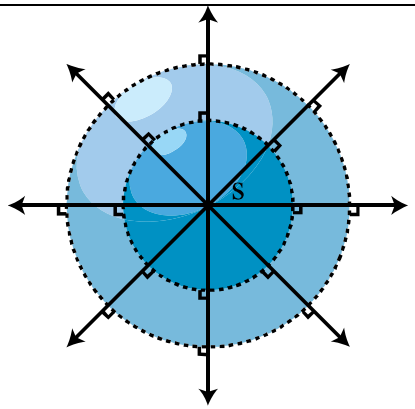

Fig 7.08

(ii) সমতল তরঙ্গমুখ (Plane Wavefront): পূর্বের অধ্যায়ে অর্থাৎ জ্যামিতিক আলোকবিজ্ঞানে তোমরা জেনে এসেছো অসীমে যদি কোন উৎস অবস্থিত হয় তবে সেখান থেকে নির্গত একগুচ্ছ আলোকরশ্মি অসীম দূরত্ব পার করলে সমান্তরাল আলোকরশ্মিতে পরিণত হয়। আমরা আগেই জেনে এসেছি, তরঙ্গের বিস্তারের অভিমুখ সবসময় তরঙ্গমুখের সাথে লম্বভাবে থাকবে। তাই এই সমান্তরাল আলোক রশ্মিগুচ্ছের সাথে লম্ব তল হবে একটি সমতল সুতরাং এই একগুচ্ছ আলোকরশ্মির জন্য তরঙ্গমুখ হবে সমতল **(Fig 7.09)**।

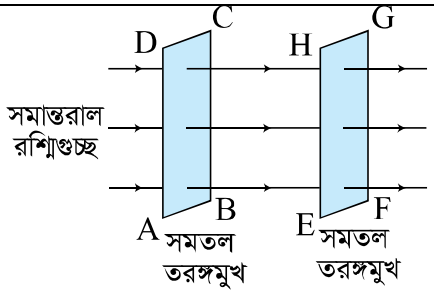

Fig 7.09

(iii) বেলনাকৃতি তরঙ্গমুখ (Cylindrical Wavefront): যদি কোন উৎস সরলরৈখিক হয় তবে সেটি থেকে চারপাশে আলো সরলপথে নির্গত হতে থাকে ফলে সবগুলো তরঙ্গকে একত্রিত করে আমরা যে তল পাই সেটি হবে সিলিন্ডার আকৃতির। তবেই কেবল তরঙ্গের অভিমুখ তরঙ্গমুখের সাথে লম্ব বরাবর হবে। অর্থাৎ সরলরৈখিক উৎসের ক্ষেত্রে উৎপন্ন তরঙ্গমুখ হবে বেলনাকৃতি।

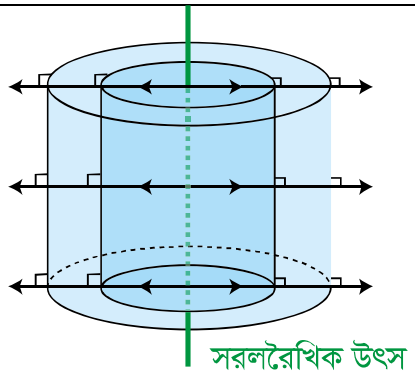

Fig 7.10

হাইগেনসের মতবাদ অনুযায়ী, তরঙ্গমুখের প্রতিটি বিন্দু থেকেই তরঙ্গ উৎপন্ন হবে। এগুলোও উৎস হিসেবে কাজ করতে পা এই বিন্দুগুলোকে বলা হয় গৌণ উৎস। তরঙ্গমুখের উপরস্থ প্রত্যেকটি বিন্দু গৌণ তরঙ্গের উৎস হিসেবে কাজ করে।

এখন এই গৌণ উৎস থেকে যে তরঙ্গ সৃষ্টি হয় তাদেরকে আমরা গৌণ তরঙ্গ বলব **Fig 7.11**। গৌণ তরঙ্গ সর্বদা সবদিকে মুখ্য তরঙ্গের সমান বেগে ছড়িয়ে পড়ে।

উৎস জানা থাকলে সাধারণ নিয়মে তরঙ্গমুখের যেকোনো সময়ের অবস্থান নির্ণয় করা যায়। উৎস জানা না থাকলেও কোনো এক সময়ের তরঙ্গমুখের অবস্থান ও আকৃতি জানা থাকলে হাইগেনসের নীতি অনুসরণ করলে অন্য যেকোনো সময়ে ওই তরঙ্গমুখের অবস্থান ও আকৃতি নির্ণয় করা যায়।

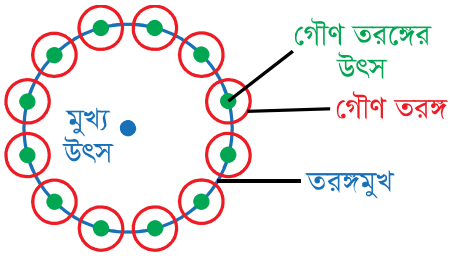

Fig 7.11

হাইগেনসের নীতির বিবৃতি: প্রাথমিক তরঙ্গমুখের উপরস্থ প্রতিটি বিন্দু এক একটি গৌণ গোলাকার ছোট তরঙ্গের উৎস হিসেবে কাজ করে এবং প্রতিটি প্রাথমিক তরঙ্গমুখ ঐ ছোট গোলাকার তরঙ্গগুলোর সমষ্টি এবং এরা মূল তরঙ্গের সমান বেগ ও কম্পাঙ্ক নিয়ে অগ্রসর হয়

তরঙ্গমুখের অবস্থান নির্ণয়

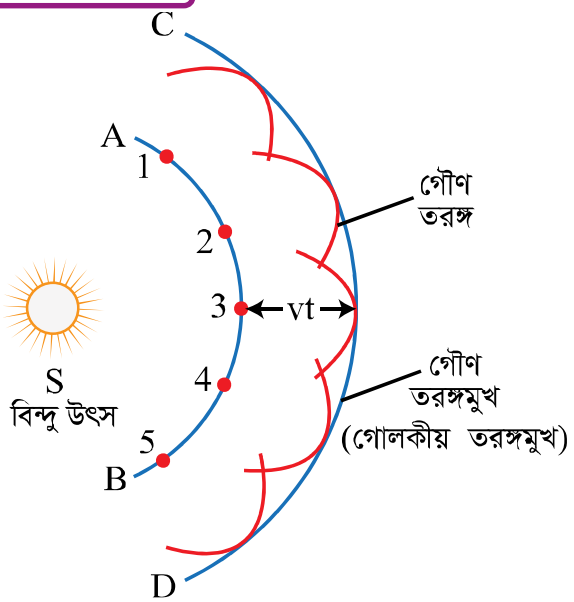

Fig 7.12 (i)

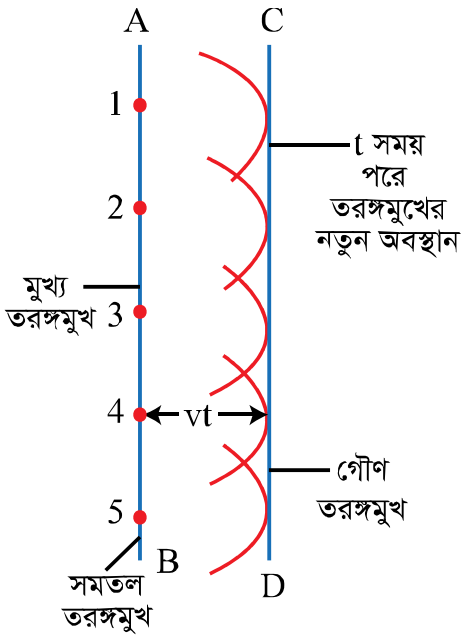

Fig 7.12 (ii)

মনেকরি, কোনো সমসত্ত্ব মাধ্যমে S একটি বিন্দু আলোক উৎস **Fig 7.12 (i)**। S এর অণুগুলোর কম্পনে উৎপন্ন তরঙ্গ চারদিকে ছড়িয়ে পড় কোনো একসময়ে তরঙ্গমুখের অবস্থান AB। হাইগেনসের নীতি অনুসারে, t সময়ে তরঙ্গমুখের অবস্থান নির্ণয় করতে হবে। তরঙ্গমুখের AB অবস্থানে 5 টি বিন্দু 1, 2, 3, 4 ও 5 বিবেচনা করা যাক, যদিও এরূপ অসংখ্য বিন্দু কল্পনা করা যায়। হাইগেনস এর নীতি অনুসারে প্রতিটি বিন্দু গৌণ তরঙ্গের উৎস হিসেবে কাজ করবে। ফলে প্রত্যেকটি গৌণ তরঙ্গের উৎস থেকে গৌণ তরঙ্গমুখ সৃষ্টি হয়। আলোর বেগ v হলে t সময়ে তরঙ্গগুলো vt দূরত্ব অতিক্রম করবে বিন্দুগুলোকে কেন্দ্র করে vt ব্যাসার্ধ নিয়ে বৃত্তচাপ আঁকি। চাপগুলোর একটি সাধারণ স্পর্শক CD আঁকি। এখন CD হলো তরঙ্গমুখের নতুন অবস্থান। বিন্দুগুলো হতে অঙ্কিত বৃত্ত বা গোলকীয় চাপই হলো গৌণ উৎস হতে উৎপন্ন তরঙ্গের t সময় পরের অবস্থা এখানে উল্লেখ্য যে ত্রিমাত্রিক স্থানে বিন্দুগুলো vt ব্যাসার্ধের গোলকীয় চাপ রচনা করবে। ওই চাপগুলোর একটি সাধারণ স্পর্শক CD একটি গোলীয় তল হবে।

সময়ের সাথে সাথে আলোক তরঙ্গ দূরে সরে যাবে এবং গোলক তলের বক্রতা কমতে থাকবে অসীম দূরত্বে একে সমতল ধরা যায়। **Fig 7.12 (ii)** এর জন্য অসীম দূরত্বে অবস্থিত উৎসের থেকে আগত তরঙ্গমুখের কোনো এক সময়ের অবস্থান AB দেখানো হয়েছে এই তরঙ্গমুখের উপর কয়েকটি বিন্দু নিয়ে ওপরের নিয়মে vt ব্যাসার্ধ নিয়ে গোলকীয় চাপ একেঁ তাদের একটি সাধারণ স্পর্শক CD আঁকলে, CD হবে তরঙ্গমুখের নতুন অবস্থা হাইগেনসের নীতি অনুসারে এটি সমতল তরঙ্গমুখ নির্দেশ করে।

আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো, তরঙ্গমুখের অবস্থান কিভাবে নির্ণয় করতে হয়। আমাদের মূলত যেটি মনে রাখতে হবে সেটি হচ্ছে, তরঙ্গমুখের যেকোনো বিন্দুই গৌণ উৎস হিসেবে কাজ করতে পারে।